দ্য বাইবেল, দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

মরিস বুকাই

ভূমিকা

ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল ও কুরআনের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মরিস বুকাই এ ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে অনেগুলো পূর্বধারণা পরিষ্কার করেছেন। এ লেখাগুলোতে তিনি ওহীকে মানবীয় ভুল বা ব্যাখ্যা থেকে আলাদা করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে নতুন কিছু বিষয় আমরা জানতে পারি। আকর্ষণীয় এই আলোচনার শেষে তিনি বিশ্বাসী মনের সামনে একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। একই ঈশ্বর থেকে আসা ওহীর ধারা। সময়ের সাথে সাথে যার প্রকাশভঙ্গী পাল্টেছে। এ আলোচনা থেকে আমরা কিছু বিষয় নিয়ে ভাবনার রসদ পাই। যে বিষয়গুলো ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলামানদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে বিভক্ত না করে বরং কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

একজন সার্জন হিসেবে মরিস বুকাই মানুষের দেহ ও আত্মা দুটো নিয়েই অনেকসময় কাজ করেছেন। আর এভাবেই তিনি মুসলমানদের ধার্মিকতা দেখে অভিভূত হয়ে যান। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলোও তাঁকে মুগ্ধ করে, যা বেশিরভাগ অমুসলিমের কাছেই এখনও অজানা। ব্যাপারগুলোর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বোঝার জন্যে তিনি আরবি ভাষা শেখেন। অধ্যয়ন করেন পবিত্র কুরআন। এতে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ দেখে অবাক হলেন। বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান থাকলে কেবল এগুলোর অর্থ বোধগম্য হয়। এরপর তিনি একেশ্বেরবাদী ধর্মগুলোর পবিত্র গ্রন্থের কথাগুলোর নির্ভুলতা যাচাইয়ের দিকে মন দিলেন। সবশেষে তিনি বাইবেলের কথা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনা করলেন। ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ ও কুরআন নিয়ে এ গবেষণারই ফসল এ বইটি।

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

প্রত্যেকটি একত্ববাদী ধর্মের নিজস্ব এক গুচ্ছ পবিত্র গ্রন্থ আছে। ধর্মপ্রাণ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের কাছে এই বইগুলোই বিশ্বাসের ভিত্তি। তাঁরা এগুলোকেই ঐশী বাণীর লিখিত রূপ মনে করেন। এই বাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুইভাবেই এসেছে। ইব্রাহীম ও মুসার (আ) ক্ষেত্রে তা এসেছে আল্লাহ থেকে সরাসরি নির্দেশের মাধ্যমে। আবার ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদের (সা) ক্ষেত্রে আল্লাহ তা পাঠিয়েছেন (মূলত) ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে। ঈসা (আ) অবশ্য বলতেন, তিনি আল্লাহর নামে কথা বলছেন।

ধর্মীয় ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল ও কুরআনকে ঐশী বাণীর লিখিত রূপ হিসেবে একই মর্যাদা দিতে হয়। নীতিগতভাবে মুসলমানরা এই মত পোষণ করেনও। তবে পাশ্চ্যাতের প্রকট ইহুদী-খৃষ্টান প্রভাবিত সমাজ কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

এর জন্য আসলে এই তিন সম্প্রদায়ের একে অপরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী।

ইহুদী ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো হিব্রু বাইবেল। এটা খৃষ্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটু আলাদা। ওল্ড টেস্তামেন্টে বাড়তি কিছু বই আছে। বাস্তব মতবাদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কোনো ভূমিকা রাখে না। ইহুদীরা অবশ্য তাদের পরবর্তী কোনো ঐশী বাণীর কথা স্বীকার করে না।

খৃষ্টানরা হিব্রু বাইবেল গ্রহণ করে তার সাথে আরও কিছু বাড়তি অংশ যোগ করেছে। তবে ঈসা বা যিশুর (আ) বাণীকে মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য লিখিত প্রকাশিত সব লেখনীকে ধর্মটি গ্রহণ করেনি। ঈসার (আ) জীবন ও শিক্ষা বিষয়ক অসংখ্য বইকে গির্জা পরিবর্তন করেছে। নিউ টেস্টামেন্টের অল্প কিছু লেখাই কেবল রক্ষিত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চারটি ক্যানোনিক গসপেল। ঈসা (আ) ও তাঁর বার শিষ্যের পরবর্তী যুগের কোনো ওহীকে খৃষ্টানরা মেনে নেয় না। স্বাভাবিকভাবেই কুরআনকে তারা আল্লাহর কিতাব বলে মানে না।

কুরআনের এসেছে যিশুর (আ) ছয় শতাব্দী পরে। হিব্রু বাইবেল ও গসপেলের অনেক তথ্য এখানে নতুন করে এসেছে। তাওরাত১ ও গসপেলে উধ্বৃতি কুরআনে একটু পর পরই দেখা যায়। কুরআনের আগে অবতীর্ণ সব আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করতে কুরআনেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (৪:১৩৬)। কুরআন নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও অন্যান্য নবীদেরকে (আ) ও তাঁদের বাণীকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। ঈসাকেও (আ) দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। গসপেলের মতোই কুরআনে ঈসার (আ) জন্মকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। হযরত মরিয়মকেও (আ) বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে। কুরআনের ১৯ নং সুরাটির নাম দেওয়া হয়েছে তাঁরই নামে।

পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ মানুষ এ কথাগুলো জানেই না। এতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য বিশ্বে বহু যুগ ধরে ধর্মকে মানবতার প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে রাখা হয়েছে অন্ধকারে। 'মহম্মদী ধর্ম' বা 'মহম্মদী' শব্দগুলোর মাধ্যমে একটি ভুল ধারণা তৈরি করে রাখা হয়েছে। যেন ইসলামের প্রচারিত বিশ্বাসগুলো একজন মানুষ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর (খৃষ্টীয় অর্থে) কোনো ভূমিকা সেখানে নেই। এমনকি বর্তমান যুগেও এ প্রচেষ্টা ও ধারণাগুলো অক্ষুণ্ণ আছে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত মানুষ ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের প্রতি আগ্রহী। কিন্তু তারা ইসলামের ওহীর দিকে দৃষ্টি দেয় না। অথচ সেটাই করা উচিত ছিল।

মুসলমানদেরকে খৃষ্টানরা কী ঘৃণার চোখেই না দেখে! একবার বাইবেল ও কুরআনের কাহিনিগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়। দেখলাম, সবাই কুরআনকে উড়িয়ে দিচ্ছে। একটু সরল চিন্তা করার জন্যেও তারা কুরআনের কথাগুলো পড়ে দেখতে ইচ্ছুক নন। অবস্থা দেখে মনে হয়, কুরআন থেকে কিছু বলা মানে যেন শয়তানের দিকে ইঙ্গিত করা।

তবে খৃষ্টীয় বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরে সম্প্রতি একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনও চোখে পড়ছে। ভ্যাটিকানের দ্য অফিস ফর দ্য ননক্রিশ্চিয়ান অ্যাফেয়ার্স একটি নথি প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের পর ১৯৭০ সালে এটি বের হয়। এতে বোঝা যায়, আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। নথিতে খৃষ্টানদেরকে মুসলামানদের সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরাতন ও ভুল ধারণা ও অপবাদের মাধ্যমে বিকৃত মনোভাব ঠিক করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও নথিতে মুসলমানদের ওপর চালানো অবিচারের দায় স্বীকার করতে বলা হয়। এই অবিচারের জন্যে পাশ্চাত্য ও এর শিক্ষাব্যবস্থাকেও দায়ী করা হয়েছে। মুসলমানদের তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন ও গোঁড়ামি সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের ভুলধারণারও এতে সমালোচনা করা হয়েছে। এতে ঈশ্বরের একত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একটি ঘটনার কথা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের কথা। কায়রোর মুসলিম ইউনিভার্সিটি অব আল আজহারের বড় মসজিদে একটি সম্মেলন হয়েছিল। এ সম্মেলনে কার্ডিনাল কোনিগ একত্ব নিয়ে কথা বললে শ্রোতারা অবাক হয়ে যান। এটি মনে করিয়ে দেয় আরেকটি জিনিসও। ১৯৬৭ সালে ভ্যাটিকান অফিস খ্রিষ্টানদেরকে বলেছিল, মুসলমানদের রমজানের রোজা শেষে সত্যিকার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শুভেচ্ছা জানাতে হবে।

রোমান ক্যাথলিক গোষ্ঠী ও ইসলামের সম্পর্ক উন্নত করার এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা পরেও অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা বের হয়েছিল। সাক্ষাতের মাধ্যমেও সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্যে এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর প্রচার কমই হয়েছে। অথচ কাজগুলো সেখানেই হয়েছে। আর সেখানেই প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশনের বেশি উপস্থিতির কারণে যোগাযোগের বহু উপায় রয়েছে।

১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখে কার্ডিনাল পিগনেডোলি আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের সাথে দেখা করেন। কিন্তু খবরটা সংবাদপত্রে খুব একটা আসেনি। ফ্রান্সের পত্রিকা *লা মন্ডে* ২৫ তারিখের কাগজে কয়েকটি লাইন মাত্র লেখে। তবে খবরটি পড়লেই সেটার গুরুত্ব বোঝা যায়। কার্ডিনাল সেখানে ইসলামী বিশ্বের সর্বোচ্চ নেটা হিসেবে বাদশাহর কাছে পোপ দ্বিতীয় পলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এতে তিনি একই ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে ইসলামী ও খ্রিষ্টান বিশ্বের একতাবদ্ধতার বিশ্বাস নিয়ে পবিত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ছয় মাস পর। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর। পোপ সৌদি আরবের গ্র্যান্ড উলেমাকে ভ্যাটিকানে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ দেন। এ সময় মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটি সংলাপ হয়। বিষয়বস্তু ছিল ইসলামে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার। পরের দিন ১৯৭৪ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে ভ্যাটিকান সংবাদপত্র *অবসেরভেটোরে রোমানো* এই ঐতিহাসিক খবরটি ছাপে। বিশপের পরামর্শ সভার সাথে বৈঠকের সমাপনী দিবসের খবরটিও আরও ছোট ছিল।

পরবর্তীতে জেনেভার গির্জাগুলোর সাধারণ পরিষদ ইকুমেনিয়াল কাউন্সিল ও স্ট্রাসবুর্গের বিশপ এলচিংগার সৌদি আরবের গ্র্যান্ড উলেমাকে অভ্যর্থনা জানান। পরে বিশপ তাকে দুপুরের প্রার্থনার সময় ক্যাথিড্রালে দাওয়াত দেন। তবে সম্ভবত ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক বলেই খবরে এসেছে। এর ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে নয়। বিভিন্ন সময় আমি মানুষকে এই ধর্মীয় ঘটনাগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই বলেছে, তারা এগুলোর কথা জানে না।

পোপ ২য় পলের ইসলামের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি দুই ধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি নিজেও বলেছেন, একই ঈশ্বরের উপাসনার ক্ষেত্রে ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের একতাবদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মুসলমানদের সম্পর্কে ক্যাথোলিক গির্জার প্রধানের অনুভূতিটা মনে করিয়ে দেওয়া আসলেই জরুরি। খ্রিষ্টানরা ইসলামের প্রতি শত্রুতার মনোভাব নিয়েই বেড়ে ওঠে। ইসলাম নিয়ে কোনোকিছু ভাবতে তারা একদম অনিচ্ছুক। ভ্যাটিকান নথিতে আক্ষেপের সাথে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই ইসলামের প্রকৃত রূপ তাদের কাছে অচেনা। ইসলামিক ওহী সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যায় মাথায়।

তবুও একটি ঈকশ্বরবাদী ধর্মের কোনো একটি দিক পর্যালোচনা করতে গেলে অন্য দুটি ধর্মের সাথে তুলনা করাটা খুবই যুক্তিযুক্ত একটি কাজ। কোনো সমস্যার সামগ্রিক বিশ্লেষণ খণ্ডিত বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। ফলে, ধর্মগ্রন্থগুলোতে থাকা কিছু বিষয় এবং বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনার জন্যে এই বইয়ে তিনটি ধর্মের কথাই আসবে। এছাড়া আরেকটি কথাও বুঝতে হবে। বর্তমান সময়ে জড়বাদ তিনটি ধর্মের জন্যেই হুমকি। ফলে, তিনটি ধর্মকে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির মাধ্যমে শক্তভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ম ও বিজ্ঞান অসঙ্গতিপূর্ণ-- এমন একটি ধারণা ইহুদি-খ্রিষ্টান মহলে যেমন আছে, তেমনি আছে ইসলামী বিশ্বেও। বিশেষ করে বিজ্ঞান মহলে এ ধারণা খুব প্রবল। ব্যাপারটাকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে অনেক ব্যাপক আলোচনা করতে হবে। এ বইয়ে আমি শুধু একটি দিক নিয়ে আলাপ করব। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মগ্রন্থগুলোকে তুলনা করব।

তার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। বর্তমানের গ্রন্থগুলো কতটা নির্ভুল? এর উত্তর পেতে হলে জানতে হবে কী পরিবেশে সেগুলোকে সংকলন করা হয়েছে। আর কীভাবেই বা সেগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

পাশ্চাত্যে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি। হাজার বছর ধরে মানুষ বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট দুই অংশকেই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। পড়ার পরে মন্তব্য এসেছে বাইবেলের কথাকে সমর্থনের সুরে। কোনো রকম সমালোচনা ছিল পাপের সামিল।